কৃষি নীতি পত্র

বাংলাদেশ

AGRICULTURAL POLICY BRIEF

BANGLADESH

বর্ষ:১ সংখ্যা: ৪
ডিসেম্বর ২০০৬

কৃষিজ রূপান্তর, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং কৃষিজমি

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র দূরীকরনে ভূমি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাছাড়া ভূমি, মানুষের স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক মূলধন, কর্মসংস্থানের উৎস, বিনিয়োগের মাধ্যম এবং ঋণ গ্রহণের বন্ধক হিসাবে কাজ করে। কৃষি ভূমি বলতে সেই ভূমি বলতে সেই ভূমিকেই বুঝায় যা আবাদ এবং চারনভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষি ভূমিতে নিরাপদ প্রবেশাধিকার ভূমিকেন্দ্রিক বৈচিত্র্যময় জীবিকা, টেকসই কৃষি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সমতা আনয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। গ্রামের সবচেয়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীই ভূমিহীন। এদের কেউ কেউ সারা বছর, কেউ বা মৌসুমী কিংবা খন্ডকালীন দিনমজুর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ভূমিহীনদের একটি বড় অংশই থাকে কর্মসংস্থানহীন। যখন তাদের নিজেদের আবাদ করার মতো কৃষি জমি থাকে না তখন তারা বর্গা চাষ, লীজ গ্রহণ

দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমান কৃষিভূমির মালিকানা রয়েছে অকৃষি-জীবীদের হাতে। যাদের বেশীর ভাগই বাস করে শহরে। তারা সাধারনত জমিগুলো বর্গা চাষ করায়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে সকল আবাদী জমিই কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কৃষি উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করছে এবং এ চাপ গিয়ে পড়ছে কৃষি জমির উপর। পাশাপাশি ক্রমাগত নিবিড় চাষের ফলে জমির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবছর ১% কৃষিজমি ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার আবাসনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভুমির উপর কখনো চাপ কমবে না বরং ক্রমান্বয়ে বাড়বে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই আমাদেরকে ভূমির অধিকতর টেকসই ব্যবহার নি-শ্চিতকরনে সুনির্দিষ্ট নীতি অবস্থান থাকতে হবে। যাদের জীবন-জীবিকা পুরোপুরি কৃষিভূমির উপর নির্ভরশীল সেই কৃষকদের ভূমিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করনার্থে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া অতি জরুরী।

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার মূল আইনগত ভিত্তি হলো ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন। এ আইনের মাধ্যমেই জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয় যা ব্রিটিশরা এ দেশে চালু করেছিল। তবে ১৯৫০ সালের আইনে সকল নাগরিকের ভূমি অধিকার সমভাবে নিশ্চিত হয়নি। ক্ষমতাবান ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা বিপুল পরিমান ভূমি এখনো বৈধ/অবৈধভাবে নিজেদের কবজায় রেখেছে। যে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ফলে দিন দিন প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েই চলছে। নীচের সারণি আমাদেরকে সেই চিত্রই তুলে ধরে। সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় ১৯৮৩-৮৪ সালে যেখানে প্রান্তিক ও ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪.০৬% ও ৮.৬৭%; ২০০৫ সালে উভয় শ্রেণীর খানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ৩৮.৬৩% এবং ১৪.০৩%।

সারণি ০১: বাংলাদেশের শ্রেণী ভিত্তিক ভূমি মালিকানা

খানার আকার	১৯৮৩-৮৪	১৯৯৬	২০০৫
প্রান্তিক (ভূমির মালিকানা ০.০৫ থেকে ০.৪৯ একর)	২৪.০৬	২৮.৪৫	৩৮.৬৩
ক্ষুদ্র (ভূমির মালিকানা ০.৫০ থেকে ২.৪৯ একর)	৪৬.২৮	৫১.৪২	৪৯.৮৬
মধ্যম (ভূমির মালিকানা ২.৫০ থেকে ৭.৪৯ একর)	২৪.৭২	১৭.৬১	১০.৩৪
বড় (ভূমির মালিকানা ৭.৫০+ একর)	৪.৯৪	২.৫২	১.১৭
ভূমিহীন	৮.৬৭	১০.১৮	১৪.০৩

উৎস: *Agriculture sample of Bangladesh 2005 (BBS June,2006)*

বাংলাদেশে ভূমি বাজার (১৯৫০- ২০০৭)

এ অঞ্চলে ভূমির মালিকানা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ মৌলিক পরিবর্তন হয় ১৯৫০ এর *East Bengal State Acquisition and Tenancy Act* of 1950 আইন অনুযায়ী । এ আইনে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি ভূমি মালিকের মধ্যবর্তী সকল গোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করে। এক পরিবারে সর্বোচ্চ ভূমিসীমা নির্ধারিত হয় ১০০ বিঘা (৩৩.৩৩ একর) অথবা পরিবারের সদস্য প্রতি

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ/দি ইনোভেটরস
বাড়ী # ১৯এ, সড়ক # ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: + (৮৮০-২) ৮১৫ ৮২৭৪, ৯১১ ০৬৩৬, ফ্যাক্স: + (৮৮০-২) ৮১৫ ৯১৩৫
ই-মেইল: info@unnayan.org, ওয়েব: www.unnayan.org

অনুর্ধ ১০ বিঘা যেটি বেশী হয়। এর বাহিরে বসতবাড়ির জন্য রাখতে পারবে আরো ১০ বিঘা। এর বাহিরে যত কৃষি জমি রয়েছে তার মালিকানা বর্তাবে রাষ্ট্রের উপর। অবশ্য, আইনটি হওয়ার পর প্রভাবশালীরা সর্বোচ্চ কৃষিভূমির মালিকানা সীমা বাড়ানোর জন্য চাপ অব্যাহত রাখে এবং সরকার শেষ পযন্ত ১৯৬০'র দশকে বাধ্য হয় সর্বোচ্চ সীমা ৩৭৫ বিঘা (১২৫ একর) নির্ধারণে (হোসাইন ও রহমান: ২০০৩)। বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও মোট কৃষি ভূমির অবস্থা বিবেচনায় নিলে কৃষি ভূমির এই মালিকানা সীমা অযৌক্তিক। ৩৭৫ বিঘার উপর কৃষিজমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যাছিল মাত্র ৫২৯ টি। সরকারের কাছে ফেরত আসা ভূমির সবটাই আবাদযোগ্য ছিল না। সিলিং এর আওতায় আসা পরিবারগুলো বেছে বেছে আবাদ অযোগ্য ভূমিই সরকারের কাছে ফেরত দিয়েছে । ফলে ঐ সময় ভূমি মালিকানায় বৃহৎ কোন পরিবর্তন হয়নি (আতিক রহমান: ১৯৮২)।

স্বাধীনতার পরপর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর *Land Holding (Limitation) Order of 1972* আইনের মাধ্যমে কৃষিভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা (৩৩.৩৩ একর) পুন:নির্ধারণ করে। সরকার এভাবে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ভূমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভূমি মালিকানার রেকর্ড যথাযথ না থাকায় সরকারের উদ্যোগ খুব একটা কাজ করেনি। আর বেশীর ভাগ খাসজমিই ছিল আবাদের অনুপযোগী। ঐ সময় সিলিং বহির্ভূত জমির পরিমান ছিল মাত্র ৮,০০,০০০ একর যা মোট আবাদী জমির ৩.৬%। কিন্ড় সরকার সিলিং বহির্ভূত জমির মধ্যে ১৪৬,০০০ একর ভূমি সরকারে দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৮৪ সালে সামরিক সরকার *Land Reforms Ordinance 1984* এর মাধ্যমে পুনরায় কৃষি ভূমির মালিকানা সীমা ১০০ বিঘা পুন:নির্ধারণ করে শর্তারোপ করে যে, এখন থেকে কোন পরিবার ৬০ বিঘার (২০ একর) উর্ধ্বে কৃষি জমির মালিক হতে পারবে না। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশও কৃষিভূমি মালিকানায় মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। তবে এ অধ্যাদেশে বর্গাচাষকে আইনের আওতায় আনা হয়। বর্গাচাষের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল তিনভাগে বিভক্ত হবে। ভূমি মালিকানার জন্য ১ ভাগ; কৃষি উপকরনের জন্য ১ ভাগ আর আবাদের জন্য ১ভাগ। বর্গাচাষের সর্বোচ্চ একটানা ৫ বছরের মেয়াদ নির্ধারিত হয় এবং চাষী ও মালিকের মধ্যে বর্গা চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়। তবে বাস্তব সত্য হলো, কোন বর্গা চাষীই কাগুজে বর্গা চুক্তি করে না। এ দেশে এখনো বর্গা চাষ হয় মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে।

ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের মতো বিপুল জনগোষ্ঠীর কৃষি প্রধান দেশে ভূমি সংস্কার নীতি নির্ধারকদের জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তবে মাঝে মধ্যে নীতিনির্ধারকরা ভূমি সংস্কারের পরিবর্তে ভূমি ব্যবস্থাপনার উপরই অধিকতর জোর দিতে দেখা গেছে। বিভিন্ন লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভূমি সংস্কার বিতর্ক ঘুরপাক খেয়েছে এই বলে যে, ভূমি সংস্কারে উৎপাদন বাড়াবে কিনা? তবে কৃষি ভূমির উৎপাদনের অতীত রেকর্ড পর্যালোচনায় এটি জোর গলায় বলা যায় যে, বড় কৃষকদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের একক প্রতি উৎপাদন বেশী। ছোট কৃষি পরিবারগুলো উৎপাদন করে নিজেদের পরিবার সদস্যদের মাধ্যমে এবং যত্নের পরিমানও বেশী করে। আব বড় কৃষকরা বিপুল জমি আবাদ করতে শ্রমিক এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া করে এবং জমি তুলনামূলক যত্ন পায় কম। ফলে তাদের খরচ বেশী এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র কৃষকদের তুলনায় কম দক্ষ।

যদি ধরেও নেই ভূমি সংস্কার আদৌ উৎপাদন বাড়াবে না। তারপরও ভূমি সংস্কারের পক্ষে আরো শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো:

(ক) ভূমি সংস্কার সামাজিক সমতা আনবে এবং

(খ) ধনী-দরিদ্রের আয় বৈষম্য হ্রাস করবে।

বাংলাদেশের মতো একটি দেশে বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে এবং তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ভূমিহীন এবং কর্মসংস্থানহীন। তারা আবাদী জমি পেলে কর্মসংস্থান হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বাড়বে। বাংলাদেশে এখনো কৃষি খাতে কর্মসংস্থান মোট শ্রম বাজারের ৪৮.১% মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ২১% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭-০৮)। যদিও সম্পদের সমতা আনয়নে ভূমি সংস্কার মৌলিক কোন প্রভাব রাখবে না তারপরও ভূমি সংস্কার গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোকে আয়ের একটি পথ করে দিবে। গ্রামীন অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করবে। কারন, ধনী কৃষকরা আয়ের উলেখযোগ্য অংশ গ্রামে ব্যয় না করে শহর বা অন্যত্র স্থানান্তর করে। আর ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের আয়ের পুরোটাই গ্রামে ব্যয় করে।

বেশ কিছু উপাদান মৌলিক ভূমি সংস্কারকে বাধাগ্রস্থ করে। যার মধ্যে অন্যতম হলো গ্রামীন শ্রেণী কাঠামো এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা। এজেন্ডা হওয়া উচিত দরিদ্রকে ক্ষমতায়িত করা। আর তা করতে হলে বর্তমান ক্ষমতা কাঠামো আমূল বদলাতে হবে। এ ধরনের পুনর্গঠন রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা খুব কমই শুরু করে। এটি আসতে হবে নীচ থেকে যারা বর্তমান ভূমি ব্যবস্থায় অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে (খান: ২০০৪)।

কৃষিভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ: ভূমি সংস্কার ও বিকল্প

বাংলাদেশের মতো ভূমি সংকটাপন্ন দেশে বিতরণমুখী ভূমি সংস্কার খুবই কঠিন কাজ। চুক্তিবদ্ধ আবাদ হতে পারে একধরনের গতিশীল কৃষিজ সংস্কার। এ পদ্ধতিতে কৃষক সাধারন ভূমি ও শ্রম দিয়ে থাকে। আর চুক্তিকারী পক্ষ দিবে যন্ত্রপাতি, উপকরণ, মূলধন প্রযুক্তি, সম্প্রসারণ সেবা এবং বাজারে প্রবেশাধিকার। বাজারের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি কৃষকের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তা চলে যাবে চুক্তিকারীর কাছে। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদি অনুযায়ী, ভোক্তা নিয়ন্ত্রিত বাজারে ভোক্তাদের উচ্চ চাহিদা ক্ষুদ্র কৃষকদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাদের জন্য চুক্তিবদ্ধ আবাদ অধিকতর উপযোগী। অবশ্য, চুক্তিবদ্ধ আবাদে শোষণ এবং ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ার ঝুকি রয়েছে। সরকারের মনিটরিং না থাকলে, ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের কৃষি উপকরণ যথা সার, বীজ, কীটনাশক, ঋণ, প্রযুক্তি ইত্যাদির জন্য মারাত্নকভাবে চুক্তিকারীর

উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। যে সব ক্ষুদ্র কৃষক চুক্তিবদ্ধ আবাদ করবে তাদের নিজস্ব সংগঠন থাকা জরুরী। একটি দল হিসাবে এটি চুক্তিকারীর সাথে তাদের দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং চুক্তির শর্ত তাদের অনুকূলে আনয়নে কাজে লাগবে।

বাংলাদেশে বর্তমান ভূমি মালিকানা অবস্থা

কৃষি খানার প্রান্তিকীকরণ বাংলাদেশের কৃষিভূমির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে যে দিন দিন প্রান্তিক ও ভূমিহীন খানার পরিমান বাড়ছে। তার উপর আবাদী কৃষি জমির পরিমান প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬০ সালে যেখানে আবাদের আওতায় থাকা মোট কৃষি জমির পরিমান ছিল ২১,৭২৭ হাজার একর আর ১৯৯৬ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৯,৯৭৪ হাজার একর। একই সময়ের মধ্যে গড় খানা প্রতি ভূমি মালিকানা ৩.৫৩ একর থেকে কমে দাড়িয়েছে ১.৭০ একরে। এই পরিসংখ্যান, আমাদেরকে আরো জানান দেয় যে, কৃষি জমি ক্রমশ বিভক্ত হয়ে পড়ছে। বার্ষিক ১% হারে কৃষি জমি কমে যাওয়া সত্যিই বাংলাদেশের জন্য বিপদ সংকেত। যদি বৃহৎ ভূমি মালিকানার সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়, তারপরও জনপ্রতি কম ভুমি মালিকানা এবং অ-কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের সীমাবদ্ধতায় এখনো এ দেশে কৃষি ভূমি বিতরণ বেশ অসম। কৃষি জমির বিভক্তী বাড়ছে বেশ উচ্চ হারে। ১৯৬০ সালে ছোট কৃষিখানা ছিল মোট কৃষিখানার মাত্র ৫২% যা ১৯৯৬ সালে এসে হয়েছে ৮০%। পাশাপাশি বড় কৃষিখানার পরিমানও কমে যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে বড় কৃষিখানার পরিমান ছিল ১০.৭% আর ১৯৯৬ সালে হয়েছে ২.৫%।

ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন মানুষের সারি

কৃষি ভূমির মালিকানা শুধু কৃষির উৎপাদনের জন্যই জরুরী নয়। সামাজিক মর্যাদা, গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো এবং অ-কৃষি অর্থনৈতক কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়াও নির্ভর করে এই ভূমি মালিকানার উপর। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রকৃত ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০%। বর্তমানে তা ৬০% ছাড়িয়ে গেছে। বার্ষিক ভূমিহীন সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.২৩% ও ২.৪২% (সারণি ২ দেখুন)। কৃষি উপকরণের ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং জমির খন্ডায়ন এসব জমিকে কৃষির অনুপযোগী করে তুলবে। একসময় দুরিদ্র কৃষকদের মালিকানায় থাকা এসব জমি বিক্রি করতে বাধ্য হবে এবং তাদের গতি হবে কোন অন্ধ বস্তিতে।

সারণি ২: অন্যান্য খানার তুলনায় কৃষি খানার ভুমিহীন হওয়ার চিত্র

খানার প্রকার/ ভূমিহীন	১৯৮৩-৮৪		১৯৯৬		বার্ষিক বৃদ্ধি (%)
	খানার সংখ্যা (হাজারে)	%	খানার সংখ্যা (হাজারে)	%	
ভূমিহীন: শ্রেণি-১ (বসতবাড়ি ও কোন আবাদী জমি কোনটিই নেই)	২৭৭	২.০০	১৬২	০.৯১	-২.৯৩
ভূমিহীন: শ্রেণি-২ (বসতবাড়ি আছে কিন্তু আবাদী জমি নেই)	২৭১৪	১৯.৬৪	৫০০৩	২৮.০৬	৫.২৩
ভূমিহীন: শ্রেণি-৩ (বসতবাড়ি আছে এবং আবাদী জমির পরিমান অনূর্ধ্ব ০.২ হেক্টর)	৩৮৯৮	২৮.২১	৫১৯১	২৯.১২	২.৪২
		৪৯.৮৫		৫৮.০৯	
প্রায় ভূমিহীন: শ্রেণি-৪ (বসতবাড়ি আছে এবং আবাদী জমির পরিমান ০.২১ থেকে ০.৪ হেক্টরের মধ্যে)	১৭০৩	১২.৩২	২৪৯৪	১৩.৯৯	৩.২৩
বাকি খানা: শ্রেণি ৪	৫২২৬	৩৭.৮২	৪৯৭৬	২৭.৯১	-০.৩৯
মোট	১৩৮১৮	১০০	১৭৮২৮	১০০	২.১৫

উৎস: *Agricultural Census Reports 1983-84, 1996 from Hands not Lands: How Livelihoods are changing in Rural Bangladesh, DFID*

বাংলাদেশে ভূমি-কৃষি সম্পর্ক

গ্রামীন বাংলাদেশে কৃষি মানুষের জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভূমিহীন জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভূস্বামীগণকে এ দেশে ক্ষমতাবান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভূমি ও কৃষির সম্পর্ক বুঝতে হলে আমাদেরকে কৃষিজ কাঠামো এবং গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে বুঝতে হবে সর্বাগ্রে। যে যত কমভূমির মালিক সমাজে তিনি তত ক্ষমতা ও মর্যাদাহীণ। ক্ষমতা কাঠামো থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক সকল ব্যবস্থা ভূমি মালিকানার উপর ভিত্তি করে তৈরী।

প্রজাস্বত্ব (Tenancy Arrangement)

গ্রামীণ সংস্কারের মূলেই রয়েছে ভূমির অধিকার তথা প্রজাস্বত্ব পরিবর্তন। বাংলাদেশে তিন ধরনের প্রজাস্বত্ব রয়েছে (সারণি ৩ দেখুন): ভূমি মালিক, নিজভূমিসহ বর্গাচাষ এবং বর্গাচাষী। বাংলাদেশে একটি উলেখযোগ্য সংখ্যক বর্গাচাষী রয়েছে এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই বর্গাচাষীর সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১.৩৯% জমি বর্গাচাষের আওতায় ছিল এবং ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩.৪৮%। সারণি ৩ আরো জানায় যে, দিন দিন আবাদী জমির গড় আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে প্রজাস্বত্বের ধরন

	১৯৮৩-৮৪			১৯৯৬			২০০৫		
প্রজাস্বত্বের ধরণ	কৃষি খানা (%)	% এলাকা	খানার গড় আকার (একর)	কৃষি খানা (%)	% এলাকা	খানার গড় আকার (একর)	কৃষি খানা (%)	% এলাকা	খানার গড় আকার (একর)
স্বমালিকানা	৬২.৭৮	৫৮.৭৬	২.১৩	৬১.৬৬	৫৮.৫১	১.৬১	৬৯.৭৬	৭৩.৩২	১.০৬
স্বমালিকানা সহ বর্গাচাষী	৩৫.৮৩	৪০.৬৯	২.৫৮	৩৪.৮৬	৩৯.৫৯	১.৯০	২৩.৭৩	২৪.০৮	১.০২
বর্গাচাষী	১.৩৯	০.৫৫	০.৮৯	৩.৪৮	১.৯০	০.৮৮	৬.৫১	২.৬০	০.৪০
মোট	১০০.০০ (১০১৯৬)	১০০.০০ (২৩১৭০)	২.২৭	১০০.০০ (১১৭৯৭)	১০০.০০ (২০২০৮)	১.৭১	১০০.০০ (১৪৫৩৬)	১০০.০০ (২৩৬২০)	১.০১

উৎস: Agriculture Census Survey, 2005

চুক্তিবদ্ধ আবাদ (Contract Farming)

চুক্তিবদ্ধ আবাদ একধরনের উলম্ব অঙ্গীভূতকরণ যেখানে কৃষক

বক্স-১: চুক্তিবদ্ধ আবাদী কৃষকদের বাজারে প্রবেশাধিকার: প্রতিশ্রুতিহীন প্রতিশ্রুতি

উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকার একজন সাধারণ কৃষক ডালিম সরকার। তিনি প্রাণ গ্রুপের সাথে চুক্তিবদ্ধ আবাদী। এক মৌসুমে তিনি প্রাণের জন্য যথারীতি ফসল উৎপাদন করেছে। কিন্তু কোন কারন দর্শানো ছাড়াই প্রাণ তার পণ্য কিনতে অস্বীকার করলো। তিনি তার জমিতে অপো করলো অন্য কোন ক্রেতা আসে কিনা। কারন আঞ্চলিক বাজারটি তার বাড়ি থেকে ১২০ কি.মি. দূরে। প্রাণের আচরণে হতাশ ডালিমের অভিব্যক্তি, "এটি ছিল পুরোপুরি লোকসান। একেবারে বসে পড়। যাদের জন্য ফসল ফলালাম তারা কিনলো না এবং অন্য ক্রেতাও পেলাম না। চোখে একেবারে অন্ধকার দেখলাম। আমি প্রতীা করেছি, আর কখনো কোন কোম্পানীর জন্য চুক্তিবদ্ধ আবাদ করবো না।

সূত্র: তিতুমীর, ২০০৬

চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমান ও মানের শস্য চুক্তিকারীকে সরবরাহ করে থাকে। চুক্তিকারী সংগ্রহকারী পূর্বেই শস্যের মূল্য ও সরবরাহ শর্ত আরোপ করে থাকে। বিশ্বের বৃহৎ এনজিও ব্র্যাক বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি কৃষি বাণিজ্যের সাথেও জড়িত। তারা চুক্তিবদ্ধ আবাদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে থাকে। তারা কুমিল্লা অঞ্চলে চুক্তিবদ্ধ আবাদের মাধ্যমে সীম সংগ্রহ করে থাকে। ফসলের জন্য তারা কৃষকদের সাথে একধরনের চুক্তি করে থাকে। অবশ্য চুক্তিটি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হওয়ায় তা আইনানুগ চুক্তি হিসাবে বিবেচ্য নয়। চুক্তিবদ্ধ আবাদের মাধ্যমে কৃষকদের জীবিকার খুব একটা গুণগত পরিবর্তন হয়নি এবং তাদের জীবন মানেরও উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেনি।

একই ভাবে দেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষি বাণিজ্য সংস্থা প্রাণ গ্রুপ রাজশাহী উত্তরবঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আবাদের মাধ্যমে ধান, ডাল ও মসলা জাতীয় পণ্য, টমেটো এবং আম সংগ্রহ করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা বিদেশেও ভালো একটি বাজার তৈরী করতে পেরেছে। প্রাণের সাথে চুক্তিটি একটি বৈধ চুক্তি। কোম্পানী চুক্তি কার্যকর না করলে নিরক্ষর এবং দরিদ্র কৃষকের পক্ষে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ বা দুরর্তী বাজারে গিয়ে পণ্য বিক্রি করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব প্রায়। প্রশাসনিকভাবে বিষয়গুলো দেখার সময় এসেছে।

কৃষি ঋণ এবং কৃষিজমি

কৃষি ঋণ বাদ দিয়ে ভূমি বাজার বিশ্লেষন করা হবে একটি অসমাপ্ত চর্চা। দরিদ্র কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে থাকে তাদের শেষ সম্বল এই একটুকরা জমি বন্ধক রেখেই। দরিদ্র কৃষকদেরকে আবাদের সময় ঋণ নিতেই হবে। কারন, কৃষি উপকরণ ক্রয় করার মতো সঞ্চয় তাদের হাতে থাকে না। আর ঋণের জামানত হিসাবে এখনো জমিই অগ্রগণ্য। এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকেও কৃষি ঋণ গ্রহণে জমি বন্ধক রাখা হয়।

জমি ক্রয়ে অর্থায়ন

গ্রামে জমি ক্রয়ের অর্থ সংগৃহীত হয় বেশ কয়েকটি উৎস থেকে। যার মধ্যে কৃষি আয় থেকে শুরু করে অকৃষি আয় এবং বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সও রয়েছে।

✪ **কৃষি আয়:** কৃষি আয় বলতে কৃষি প্রাপ্ত আয় দিয়ে মৌলিক চাহিদা পূরনের পর কৃষকের হাতে যে অর্থ জমা থাকে তাকে বুঝানো হচ্ছে। যে সব কৃষক কৃষিকে লাভজনক করতে পারে তাদের প্রথম লক্ষ্যই থাকে আরো জমি ক্রয়ের।

✪ **অ-কৃষি আয়:** ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য কৃষি বহিভূর্ত আয় মানুষজন জমিয়ে রাখে কৃষি জমি ক্রয়ের জন্য। কারন ভুমিতে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক ও নিরাপদ।

✪ **রেমিটেন্স:** বিদেশ থেকে রেমিটেন্স আকারে প্রেরিত অর্থের মূলত দু'টি লক্ষ্য থাকে। প্রথমত মৌলিক চাহিদা পূরনের পর বসতবাড়ি পরিপাটি করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অধিক জমি ক্রয়। বাংলাদেশে প্রেরিত রেমিটেন্সের মধ্যে ১১.২৪% ব্যয় হয় জমি ক্রয়ের জন্য (INAFI Bangladesh Working Paper Series No. 1,2006) মাঠ সমীক্ষা পরিচালনাকালে দেখা গেছে গ্রামের যেসব লোক শ্রমিক হিসাবে বা কাজ করার জন্য বিদেশ গিয়েছে তারা তাদের রেমিটেন্স থেকে প্রথমেই বন্দকৃত জমি পুনরুদ্ধার করতে বলেছেন এবং পরবর্তীতে আরো জমি ক্রয় করার জন্য পরিবার সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছে।

✪ **ধার/ঋণ:** জমি ক্রয়ের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে অনেক সময় মানুষ মহাজন, বন্ধু-বান্ধব ও নিকট আত্মীয় এবং ব্যাংকস প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন।

✪ **অন্তর্বর্তীকালীন বিক্রয়:** তাদের জন্য বেশী উপযোগী জমি ক্রয়ের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিও বিক্রয় হয়ে থাকে। গ্রামে কৃষকরা এ ক্ষেত্রে দূরের জমি বিক্রি করে বাড়ির কাছের জমি ক্রয়ের প্রবনতা দেখান।

✪ **বিবিধ উৎস:** উপরোল্লিখিত উৎস ছাড়াও ক্রেতার পক্ষে সম্ভব অন্যান্য উৎস থেকে জমি ক্রয়ের সময় অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

জমি বিক্রির কারণ

গ্রামে যাই ঘটুক না কেন তারা জমি বিক্রি করতে চান না। ফলে গ্রামে জমি বাজার অনেকটা স্থিত হয়ে পড়ে আছে। জমি তাদের কাছে বেচেঁ থাকার অবলম্বন। সাধারনত তিনটি প্রধান কারণে তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন:

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিপদে পড়ে বিক্রি: এমন কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে এবং বেঁচে থাকার জন্য জমি বিক্রি করা আর কোন উপায় নেই কেবল তখনই জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরূপ কারণের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ফসলহানি, পরিবারের সদস্যদের মারাত্নক ব্যাধির চিকিৎসা করা, সন্তানের বিয়ের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদন, ঋণের বন্ধক ইত্যাদি।

(খ) সম্পদ রূপান্তর এবং অন্তর্বর্তীকালীন জমি ক্রয়: জমির ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পর জীবনের মান উন্নয়নের জন্য জমিকে অন্য সম্পদে রূপান্তরের জন্যও জমি বিক্রির ঘটনা ঘটে। যেমন: বাড়ি তৈরী করা, যানবাহন ক্রয়, গয়না ক্রয় ইত্যাদি।

(গ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বহুমুখীকরনের জন্য: অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বহুমুখীকরনের জন্যও জমি বিক্রি হয়। যেমন: শহরে চাকুরী গ্রহণ, বিদেশ যাত্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ ইত্যাদি।

ভূমি বাজারের প্রাসংগিক বিষয়াবলী

✪ **গ্রামীণ অনিরাপত্তা এবং অস্থিতিশীলতা বোধ :**

গ্রামে জমি হলো সকল ধরনের ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি। তাই যে কোন উপায়েই তারা জমি ক্রয় করতে চায়। ফলশ্রুতিতে, জমি নিয়ে প্রায়শই বিরোধ দেখা দেয় এবং এতে প্রাণহানি ও মামলা মোকাদ্দমার ঘটনাও ঘটে। ভূমি অধিকার শুধু শ্রেনী ইস্যুই নয় বরং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। গ্রামে শ্রেণী নির্বিশেষে ভূমি বিরোধ থেকে ভূমি হারানো ও প্রাপ্তির ঘটনা ঘটে। ভুমি চলে গেলে অনিরাপদ হয়ে পড়বে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যাবে এই আশংকা থেকেই মূলত জমি সংক্রান্ত বিরোধের সূত্রপাত। দূর্বল লোকদের গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোয় অবস্থান খুবই দুর্বল রয়েছে। তারাই মূলত জমি হারানোর ভয়ে থাকে সবচেয়ে বেশী। মাস্তান, জোতদার এবং গ্রামীন প্রভাবশালীরা তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব ব্যবহার করে দরিদ্রের

জমি গ্রাস করার জন্য। সরকারী ভূমি গ্রাসও দরিদ্র -ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকী। কারণ এ সব ভূমিতে তাদের অধিকার বেশী। দরিদ্ররা প্রশাসন, পুলিশ বা রাজনীতিক কারোই আনুকূল্য পান না। যেটি পান ধনী-প্রভাবশালী জোতদাররা। পাশাপাশি, সরকারী খাস জমি, জলাভূমি, বন ইত্যাদি গ্রাসের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগান্তি হয় সবচেয়ে বেশী। কারন তারাই বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলাবদ্ধতার প্রথম শিকার এবং এসব Common Property দূর্যোগকালে তাদের আশ্রয়।

✪ **খাসজমি:** খাসজমি প্রকৃত অর্থে ভূমিহীনদের জমি। বাংলাদেশের বেশীরভাগ খাস জমি প্রভাবশালীদের অবৈধ দখলে। খাস জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রায় জীবনের জন্য হুমকী হয়ে দাড়ায়। খাসজমি জবরদখলকারী মাস্তান, জোতদাররা এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরনের বিধান থাকলেও ভূমিহীনদের বদলে তা বন্দোবস্ত পাচ্ছে প্রভাবশালীরা। ২০০১ সালে আবুল বারাকাতের গবেষণা অনুযায়ী ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ১২ লাখ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৮% পেয়েছে সচ্ছল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। বাকি ১২% পেয়েছে ভূমিহীনরা (বারাকাত: ২০০১)। বিতরণকৃত ভূমির কতভাগ ভূমিহীনরা দখল ধরে পেয়েছে বা দখল ধরে রাখতে পেরেছে তার কোন পরিসংখ্যান সরকারী দপ্তরে নেই।

সারণি ৪: অবৈধ দখল (লক্ষ একর)

জমির শ্রেণী	সরকার পরিসংখ্যানমতে[১]			বেসরকারী পরিসংখ্যান[২]		
	মোট	অবৈধ দখল	%	মোট	অবৈধ দখল	%
খাসজমি	১৪	৫	৩৫.৭	৩৩	১০	৩৩
অর্পিত সম্পত্তি	৬.৪৩	৪.৪৫	৬৯.২	২১	১৮.৯	৯০
ওয়াকফ সম্পত্তি	৯	৭	৭৭.১	-	-	

উৎস: Titumir, R. and G. Sarwar (2006)

✪ **উৎস পরিমান (একর)** ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে (২০০৩[৩])৬ লক্ষ আর ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি,এর হিসাব মতে (২০০৪) তথ্যমতে ১৪ লক্ষ এবং বারাকাত, জামান এবং রহমান, (২০০১) এর হিসাব অনুযায়ী ৩৩ লক্ষ সরকারী সম্পত্তির অবৈধ দখলে রয়েছে। বিভিন্ন উৎসের তথ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এটি স্বীকৃত যে, সরকারী সম্পত্তির বিরাট অংশ অবৈধ দখলে। ৩৫.৭% খাসজমি অবৈধ দখলে রয়েছে। সরকারী সম্পত্তির মোট পরিসংখ্যান নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে।

সারণি ৫ থেকে তাই প্রতীয়মান হয়।

উৎস	পরিমান (একর)
ভূমি মন্ত্রণালয় ২০০৩[৩]	৬ লক্ষ
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ২০০৪	১৪ লক্ষ
বারাকাত, জামান এবং রহমান, ২০০১	৩৩ লক্ষ

বাংলাদেশে খাসজমি, চর, বন, জলাভূমি, নদী কোন কিছুই অবৈধ দখল থেকে মুক্ত নয়। প্রভাবশালীরা প্রথমে জমিতে অবৈধ দখলে যায়। তারপর বিভিন্ন জাল দলিল তৈরী করে আদালতের মাধ্যমে ডিক্রি নিয়ে মালিকানা নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে দখলের সাধারণ প্রক্রিয়া নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র ১: সরকারী সম্পত্তি দখল প্রক্রিয়া

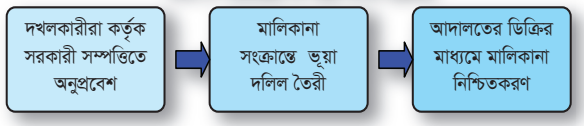

প্রক্রিয়াটি একটু নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে অবৈধ দখল প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা না থাকলে পুরো প্রক্রিয়া সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব।

সারণি ৬: বাংলাদেশে চর এলাকা

নদী	চর (বর্গকি.মি.)
যমুনা	৯৮৭.৬০
পদ্মা	৫০৮.২৭
মেঘনা (উত্তর বেসিন)	৪৬.২৭
মেঘনা (দক্ষিণ বেসিন)	১৮০.৭৫

উৎস: : ISPAN, 2000

✪ **চর এলাকা:** চরের দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাংলাদেশে নতুন নয়। তবে দিন দিন সংঘর্ষের হিংস্রতা ও প্রাণহানির ঘটনা বেশী ঘটছে। ISPAN (Irrigation Support Project for Asia and the Near East) প্রকল্প থেকে প্রকাশিত *River-ine Chars in Bangladesh* in 2000 এর তথ্য মতে বাংলাদেশে পাচটি

বৃহৎ নদীতে প্রায় ১,৭২২.৮৯ বর্গকি.মি চর এলাকা রয়েছে। পাশাপাশি ছোট ছোট নদীগুলোতেও অসংখ্য চর রয়েছে। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় চরগুলোতে দখল নিয়ে মারাত্নক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সাধারনত চরগুলোতে ভূমিহীনরা জীবিকার তাগিদে আশ্রয়গ্রহণ করলেও জোতদার, মাস্তানরা রাজনীতিক এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় ঐসব ভূমিহীনদেরকে উচ্ছেদ করে দেয়। মাঝে মধ্যে বড় বড় চরগুলোতে যুদ্ধাবস্থা পরিস্থিতি তৈরী হয়। জোতদাররা এ কাজে নিজের অর্থে পোষা লাঠিয়াল বাহিনী নামিয়ে দেয়। সারণি ৬ তে চর এলাকার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অবৈধ দখল নিয়ে প্রায়ই খবর ও প্রতিবেদন বের হয়। যেমন দৈনিক সংবাদের ১৫ জুলাই ২০০৫ এর সংখ্যায় বলা হয়েছিল সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে রূপগঞ্জে মাত্র ৪০০ ভূমি দস্যু প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে।

✪ **ব্যক্তি সম্পত্তি ও মামলা মোকাদ্দমা:** সরকারী হিসাবমতে ২০০৪ সালে ভূমি সংক্রান্তে বিভিন্ন আদালেতে ৮ লক্ষ মামালা বিচারাধীন রয়েছে। যদিও আবুল বারাকাত ও প্রশান্ত রায় একই বছরে মামলা সংখ্যা দেখিয়েছেন ৩২ লাখ (বারাকাত: ২০০৪)। গড় পরতা মালিকানা সংক্রান্ত একটি দেওয়ানী মামলা নিস্পত্তিতে

প্রায় ১ দশক লাগে। একই গবেষণায় বলা হয়েছিল উক্ত মামলায় ১৫০ মিলিয়ন জনগণ সংশ্লিষ্ট। যদিও ঐ সময় মোট জনসংখ্যা ছিল১৩০ মিলিয়ন। একই ব্যক্তি একাধিক মামলায় সংশ্লিষ্ট থাকে বলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মে ২০০৩ পর্যন্ত আদিবাসী এবং সরকার কর্তৃক পুনর্বাসিত লোকদের মধ্যে ৩৫,০০০ টি ভূমি সংক্রান্ত মামলা হয়েছিল।

সারণি ৭: বাংলাদেশে ভূমি সংক্রান্ত মামলা সংখ্যা

উৎস	বিচারাধীন মামলা সংখ্যা[৪]	ক্ষতিগ্রস্থ লোকের সংখ্যা	ভূমি মামলা নিষ্পত্তিতে গড় সময়কাল
বাংলাদেশ সরকার, ২০০৪	৮ লাখ	-	
বারাকাত এবং প্রশান্ড়রায়, ২০০৪	৩২ লাখ	১৫০ মিলিয়ন	৯.৫ বৎসর

ভূমি প্রশাসন: ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনাও একটি ক্ষেত্র যেখানেও জমি নিয়ে বিপুল সংখ্যক বিরোধ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিমালিকানার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে দুর্বল রেকর্ড সংরক্ষণ, দুর্নীতি এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রশাসনের অদক্ষতার কারনে। বাংলাদেশে ভূমি হস্তান্তর অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। চিত্র ২-তে জমি হস্তান্তরের কুশিলবসহ জটিল প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো:

চিত্র ২: জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া

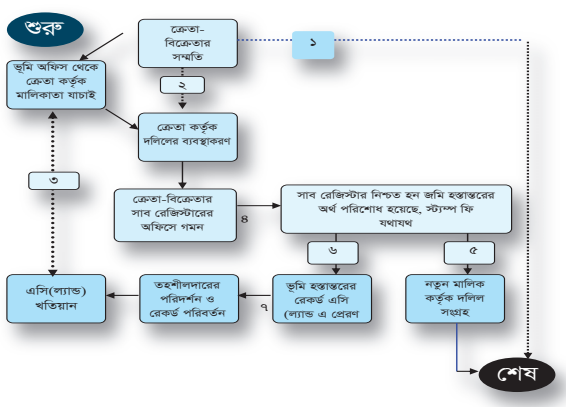

জমি হস্তান্তরের সাথে সরকারের দু'টি বিভাগ জড়িত: সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা AC land এবং সাব-রেজিস্টার অফিস। টিআইবি'র ২০০৪ সালের হিসাবমতে জমি রেজিস্ট্রি করতে প্রতি লোককে গড়ে ৩,৭৬৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। নামজারী বা মিউটেশন করতে ঘুষের পরিমান ২,০৪৭ টাকা এবং ভূমি সংক্রান্ত দলিল সংগ্রহে ঘুষ দিতে হয়েছে ৯৬১ টাকা। জরিপকালে জনপ্রতি গড় ঘুষ প্রদান ২,৩৭০ টাকা এবং খাস জমি বন্দোবস্তে ঘুষের পরিমান ৯,৫৭৫ টাকা। বিভিন্ন গবেষণায় ঘুষের পরিমানে পার্থক্য থাকলেও ঘুষ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কোন দ্বীমত নেই। (ভূমি প্রশাসনের দুর্নীতির চিত্র দেখুন বক্স২ তে)। এটি সবসময় বলা হচ্ছে যে, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আসলে ভূমি উদ্বেগ এবং বিরোধ অনেকটা কমে আসবে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় টেকসই পরিবর্তন আনতে হলে ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের অসংগতি, দূর্নীতি দূর করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে দক্ষ ও সৎ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং রেকর্ড সংরক্ষণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা গেল ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনেকটা শৃঙ্খলা ফিরে আসবে মর্মে বিশেষজ্ঞগন মনে করেন।

বক্স ২: ভূমি প্রশাসনে দুর্নীতি

দুর্নীতি চিত্র ১: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ২০০৪

- ৯৭% পরিবার যারা জমি কিনেছে তাদেরকে জমি রেজিস্ট্রেশনের সময় গড়ে ৩৭৬৪/- টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।
- ৮৮% পরিবারকে জমি ক্রয়ের পর মিউটেশন বা নামজারীকালে গড়ে ২০৪৭/- টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।
- ৮৫% পরিবার যারা জমি কিনেছে তাদেরকে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহকালে গড়ে ৯৬১/- টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।
- ৮৩% পরিবাকে জমি জরিপকালে গড়ে ২৩৭০/- টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।
- ৪০% পরিবার যারা খাসজমি বন্দোবস্ত নিয়েছেন তাদেরকে গড়ে ৯৫৭৫/- টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

দুর্নীতি চিত্র ২: কানিজ সিদ্দিকি, ২০০১

ঘুষ গ্রহকারী দপ্তর	ঘুষের পরিমান
জরিপ বিভাগ	৪০০/- টাকা
ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস	১০০৯/- টাকা
ভূমি জরিপ বিভাগ	৯৫৩/- টাকা
তহশীল অফিস	৩৬৮/- টাকা

- ১ একর খাস জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য পরিবার প্রতি ৭,০০০- ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানী

শহর এবং শহরতলী এলাকায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানীগুলো দুর্বল মালিকানাসম্পন্ন জমি তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে ভূমি উন্নয়ন করে জনগণের কাছে বিক্রি করছে। ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন হাউজিং কোম্পানী গ্রাহক এবং জমির মূল বিক্রেতার সাথে প্রতারনারও অভিযোগ পাওয়া যায়। তাদের এ প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধমূলক এবং ভূমি বাজারেরর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

চিংড়ি ঘের

উপকূলবর্তী এলাকায় প্রভাবশালীগণ কর্তৃক চিংড়ি চাষের জন্য অনেক ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি জবরদস্তিমূলক ভাবে নিয়ে নিচ্ছে। চিংড়ি ঘেরের জন্য জমি নিতে মূল মালিককে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। চিংড়ি ঘেরের জমির পরবর্তীতে উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব এগিয়ে না এলে এ ধরনের আগ্রাসন থেকে ক্ষুদ্র কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। চিংড়ি ঘেরের জন্য জবরদস্তিমূলক জমি গ্রাস করা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষিভূমি

বাংলাদেশে উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসারের মাঝে অবস্থিত এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ। তাই দেশটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন অঞ্চল । অধিক জনসংখ্যার চাপ এবং জলবায়ুগত পরিবতর্নের মুখে দেশটির ঝুকিপ্রবনতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগে জীবন ও সম্পদহানি ঘটছে। দেশের বৃহ নদীগুলোর (ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা) বিশাল পরিমান পলিমাটি বহনে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া এবং বর্ষা মৌসুমে উজানের পানির তীব্র স্রোতে বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জলবায়ুতে

পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুকি তুলনামূলকভাবে একটু বেশী। বৈশ্বয়িক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকলে দ্বীপসহ উপকূলের বিরাট একটি অংশ পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক জনগন জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে খরা, বন্যা, সুনামী, জলোচ্ছাস, ঘুণিঝড় ইত্যাদির প্রকোপ বাড়বে। তাপমাত্রা, বৃষ্টির পরিমান, কুয়াশার ঘন ঘন পরিবর্তনে উৎপাদনে ঋণাত্নক প্রভাব ফেলবে। শস্য পঞ্জিকা পরিবর্তিত হবে। উপকূলবর্তী এলাকায় লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং আবাদী জমির পরিমান কমে যাবে। ফলে দরিদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং তাদের দারিদ্র বাড়বে। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারনে উৎপাদনে ইতোমধ্যেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। উপকূল এলাকায় নারিকেল এবং পান উৎপাদন কমতে শুরু করেছে। তাছাড়া উপকূলের লবনাক্ততায় উৎপন্ন সবজির স্বাদ সাধারণ মাটিতে উৎপন্ন সবজির চেয়ে কম(IRIN)।

ভূমিতে নারীর মালিকানা

উৎপাদন উপকরণে নারীর অধিকারকে অস্বীকার করার উপায় নেই। পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে নারীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারপরও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রাপ্ততা অনুযায়ী হয়নি। বাংলাদেশে নারী-প্রধান পরিবারগুলোতে দারিদ্র চরম আকারের। কারণ, ভূমিসহ উৎপাদন উপকরনে নারীর প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। যদি গ্রামে ভূমিতে নারীর প্রবেশাধিকার আরো বৃদ্ধি করা যায়, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কৃষির জমির মালিকানা লাভ, সাধার ব্যবহার্য সম্পত্তি (village common lands) যথা রাস্তার ধার, সরকারী জলাভূমি, বন ইত্যাদিতে প্রবেশাধিকার নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কৃষি উৎপাদনে বিশেষত বীজ সংরক্ষণ, ফসল আহরণ উত্তর যাবতীয় কাজ নারীরা করে থাকে। আর সাধার ব্যবহার্য ভূমি প্রভাশালীদের কাছে বেহাত হয়ে যাচ্ছে বিধায় নারীর অধিকার খর্বিত হচ্ছে এবং তাদের জীবন যাত্রার মান কমে যাচ্ছে। প্রায় ৭৮.৩% নারী কৃষিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তারপরও তাদের এ অবদাদের কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। নারীরা সম্পত্তির মালিকানা পাচ্ছে খুবই কম। যাও পাচ্ছে তা পূরুষের সাথে অংশত। ভূমিতে নারীর অধিকার সংক্রান্তে দেশের বিদ্যমান আইন কানুন এবং সামাজিক রীতি নীতিও নারীর পক্ষে নয়। তবে বর্তমানে খাসজমি বন্দোবস্ত স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে একসাথে দেওয়া হয়।

নীতি বিকল্প *(Policy Option)*

ভূমি ও কৃষক ছাড়া কৃষি ও উৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষি ভূমি থেকে কৃষকরা দিন দিন বিতারিত হচ্ছে। ভূমিকে কেন্দ্র করে তৈরী হচ্ছে নানান বিরোধ। অসাধু ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং জমির জন্য প্রভাবশালীদের রাহুগ্রাসের কারনে সাধারন কৃষকদের ভূমির মালিকানা দিন দিন সংকটাপন্ন হয়ে যাচ্ছে। কৃষির উৎপাদন টেকসইভাবে বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি ভূমিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং নারীদের মালিকানা এবং প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে। রাষ্ট্রীয় নীতি গৃহীত হতে হবে তার আলোকে। নিম্নের নীতি বিকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হলো:

১। ভূমি সংস্কার নীতি ও ভূমি প্রশাসন: ভূমি সংস্কার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলে আসছে। এক ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে যে, ভূমি সংস্কার করে যে জমি সরকারের হাতে আসবে তা দিয়ে জীবন চালানোর মতো কৃষিকাজ করা যাবে না। বাংলাদেশে এখনো ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত হালনাগাদ কোন তথ্য নেই। ভূমির মালিকানার যথাযথ তথ্য না থাকায় যত জটিলতা। ভূমি প্রশাসন কাঠামোতে ব্যাপক সংস্কার করা প্রয়োজন। কাঙ্খিত ভূমি সংস্কারের জন্য কয়েকটি মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- ভূমি মালিকানার হালনাগদ তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- নির্ভরযোগ্য একটি ভূমি বাজার সৃষ্টি;
- ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ, স্বল্প মেয়াদি করা।
- অকার্যকর ভূমি প্রশাসনকে দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনমুখী করা;
- ভূমি মালিকানার রেকর্ড নিয়মিত হালকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা কমিয়ে আনা;
- খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন ;
- ভূমি মালিকানা পরিবর্তনের সকল তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি ' ভূমি মালিকানা তথ্যা ব্যাংক' তৈরী করা। তিন উপায়ে ভূমি মালিকানা রেকর্ড সংরক্ষণ করা দরকার (১) মুদ্রিত আকারে (২) প্রাতিষ্ঠানিক আকারে মালিকানা সংরক্ষণ (৩) মৌজা ম্যাপসহ একটি সংস্পূণ মালিকানা তথ্যের ডিজিটাল রেকর্ড এবং জনগনের তাতে অবাদ প্রবেশাধিকার। বর্তমান খতিয়ান পদ্ধতির পরিবর্তে ভূমি মালিককে Certificate of Land Ownership (CLO) প্রদান। CLO তে জমির নকসা, চৌহদ্দি, ভূমি মালিকের ছবি থাকতে হবে এবং নিয়মিত তা হালকরন করতে হবে।
- সরকারী ভূমি গ্রাসের কারণগুলো চিহ্নিত করে দাযীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

২। প্রজাস্বত্ব সংস্কার নীতি: প্রজাস্বত্ব আইনে পরিবর্তন আনয়ন করা জরুরী। সাধার ব্যবহার্য জমিতে ভূমিহীন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করনার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে বর্গাচাষীর অধিকার এখনো কাগজে কলমে রয়েছে তা বাস্তবে রূপদান করতে হবে। অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে। প্রয়োজনে আন্তবর্তীকালীন মালিকানার ব্যবস্থা করা। যেমন: Community land trust, community leases, private land leases and certificate of rights. আবাদী ভূমির মালিকানা আবশ্যিকভাবে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩। জাতীয় কৃষি নীতি ও ভূমি নীতি: জাতীয় কৃষি ও ভূমি ব্যবহার নীতি হালনাগাদ করা এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। কৃষিভূমি অন্য কাজে ব্যবহারাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করা। প্রস্তাবিত কৃষিনীতি ভূমি সংক্রান্তে কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে:

- মৃত্তিকা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক Land zoning
- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যাহার নিশ্চিতকরনের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন
- একই জমিতে একাধিক ফসল ফললেও কৃষকদের জন্য অধিক লাভজনক আবাদকে উৎসাহিত করা হবে

✪ ভূমি ব্যবহার নীতি হালনাগাদ করে কঠোর বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন
✪ জমির উর্বরতা ধরে রাখার জন্য শস্যাবর্তন পদ্ধতির প্রয়োগ
✪ আবাদী জমি কোনভাবেই ফেলে রাখা যাবে না।

৪। কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বিকল্প: কৃষকদেরকে কৃষি উপকরন ও উৎপাদনের সম্মুখ- পশ্চাৎ যোগসূত্র স্থাপনে আইনগত এবং পরামর্শগত সেবা প্রদান করা। দরিদ্র কৃষকরা প্রায়শই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি প্রভাবশালীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রজুসহ হয়রানী করে থাকে। বর্তমানে অধিকার ভিত্তিক কিছু এনজিও কৃষকদের কল্যাণ নিয়ে কাজ করে, যেমন- নিজেরা করি, সমতা ইত্যাদি। কৃষি সম্প্রসারণ সেবায় সরকারী-বেসরকারি সংস্থাকে একসাথে কাজ করার জন্য সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৫। গ্রামীণ সংস্কার নীতি: গ্রামীণ সংস্কার এবং পল্লী উন্নয়ন একসাথে গাঁথা। গ্রামীণ সংস্করের মৌলিক উদ্দেশই হলো পল্লীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা। গ্রামীণ সংস্কার অবশ্যই রাষ্ট্রকেই শুরু করতে হবে। গ্রামীণ সংস্কারের মধ্যে রয়েছে কৃষকদের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কৃষি ঋণ এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার। দেশের পুরো কৃষি ব্যবস্থাকেই নতুন দিক নির্দেশনা প্রদানই গ্রামীণ সংস্কার হিসাবে বিবেচনা করা যায়। গ্রামীণ সংস্কারের আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
✪ ভূমিতে প্রবেশাধিকার বাড়িয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করা
✪ আদিবাসীদেরকে তাদের ভূমি ও সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার প্রদান
✪ ভূমি, দারিদ্র দূরীকরণ, সামাজিক ন্যায় বিচার ও উন্নয়নের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র তৈরীকরন
✪ প্রাকৃতি সম্পত্তিতে কৃষক ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন
✪ স্বচ্ছ ও দক্ষভাবে ব্যক্তি ভূমি অধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থাকরণ
✪ গ্রামীণ সংস্কারে যুবশ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন
✪ LEADER এপ্রোচের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্র তৈরী
✪ কৃষকদেরকে বিজ্ঞানসূত্রে সাক্ষর করা
✪ কৃষির প্রাকৃতি পরিবেশকে রক্ষা করা

নীতি ছক

ভূমি মালিকানা/সংস্কার প্রসংগ	নীতি পদক্ষেপ	মন্তব্য
পদ্ধতিগত ভূমি মালিকানার রেকর্ড না থাকা	▪ একটি নির্ভরযোগ্য ভূমি বাজার তৈরীর জন্য ভূমি মালিকানার তথ্য সংরক্ষণ যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরন ▪ সাধারণ জনগনের ভোগান্তি কমানোর জন্য পুরানো ধাচের ও অকার্যকার ভূমি প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো ▪ ভূমি মালিকানার তথ্য হালনাগাদ করে ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা ▪ খাসজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমকে গতিশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা	▪ ভূমিভ্রণালয় ইতোমধ্যে ডিজিটাল ভূমি মালিকানার তথ্য তৈরীর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পাইলট প্রকল্প নরসিংদি জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে
প্রজাস্বত্ব সংস্কার	▪ বর্গাচাষকে অধিকতর কৃষক বান্ধব করার জন্য স্থির চুক্তির ব্যবস্থা করা ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সরকার এ ক্ষেত্রে ভূমি মালিকের খাজনা পরিমান নির্ধারণ করে দিতে পারে।	▪ ভারতে ভূমির খাজনা স্থানীয় সরকার কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়।
ভূমি সংক্রান্তে মিথ্যা মামলা	▪ নিবেদিতপ্রাণ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিকার ভিত্তিক কাজ করা বেসরকারী সংস্থা সংযুক্তির মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদান।	▪ কৃষকদের মিথ্যা মামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য সমতা এবং নিজেরা করি এনজিও কাজ করে

উপসংহার

দারিদ্র দুরীকরনের জন্য ভূমি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কৃষি ভিত্তিক জীবিকার মূল চালিকা হলো ভূমি। উপরের আলোচনায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভূমি বাজার খুবই অসম। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর আবাদযোগ্য কোন জমি নেই। কারো কারো আবার নিজেদের বসববাড়িটি পর্যন্তও নেই। এইরূপ লোকের সংখ্যাও নেহায়াৎ কম নয়। বর্তমান ভূমি মালিকানা বিত্তশালী কেন্দ্রিক। ভূমি সংস্কার নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বাংলাদেশের বিশাল ভ ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় ' ভূমি সংস্কারের বিকল্প নেই'। খাসজমিতে প্রভাবশালীদের নয় ক্ষুদ্র ও ভ ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা হতে হবে জনবান্ধব ও দক্ষ। এখানে দুর্নীতির সুযোগ রাখার কোন অবকাশ নেই। যখনই এখানে দুর্নীরিত বাসা বাধবে একই সাথে ভূমি নিয়ে বিরোধও বাধবে। আধুনিক ভূমি মালিকানা রেকর্ড তৈরী ও হালনাগাদ করতে পারলে আমরা অনেক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো নি:সন্দেহে।

নীতিপত্র (Policy Brief) উন্নয়ন অন্বেষণ (Unnayan Onneshan- The Innovators) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। মেহরুন ইসলাম চৌধুরী প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদন The agrarian Transition and the Livelihoods of the Rural Poor: Agricultural Land Market অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনুদিত ও সংক্ষেপিত আকারে বর্তমান সংখ্যাটি প্রস্তুত করেছেন ***দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর***। সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন এম নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব, উন্নয়ন অন্বেষণ।

সংখ্যাটি অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল এর সহায়তায় প্রকাশিত। মূল গবেষণাপত্রের ইংরেজী সংস্করণ পাওয়া যাবে www.unnayan.org.

পাদটীকা: তথ্যসূত্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মূল গবেষণা পত্রে রয়েছে।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

উন্নয়ন অন্বেষণ- দি ইনোভেটরস একটি স্বাধীন অলাভজনক নিবন্ধনকৃত ট্রাষ্ট। এর লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন চিন্তা, গবেষণা, এডভোকেসি, সংহতি এবং কর্ম পরিকল্পনা উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখা। স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক দারিদ্র, অন্যায়, লিঙ্গ বৈষম্য এবং পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে সমাধান বের করতে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই বিকল্প গননীতি পর্যবেক্ষণ সংস্থাটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের গবেষণা দর্শন ও মডেল হচ্ছে বহুমাত্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন।